দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 APR 1993
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার হাল

দেশের ৭০ শতাংশ স্কুলেই ল্যাবরেটরী নেই

হাসান হাফিজ ঃ গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৭০টি স্কুলেই বিজ্ঞান শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ ল্যাবরেটরীর কোন অস্তিত্ব নেই। যা আছে তা মূলতঃ প্রধান শিক্ষকের কক্ষ, সেটাতে লাইব্রেরীও অবস্থিত। অথচ আদর্শ ল্যাবের জন্য ন্যূনতম তিনটি কক্ষ থাকার নিয়ম।

নরসিংদী জেলার একটি বেসরকারী স্কুলের 'ল্যাবরেটরীতে' দেখলাম নরকঙ্কালের অর্ধাংশ মেঝেতে ধূলোয় গড়াচ্ছে। পদার্থবিদ্যা, রসায়নের সাজ-সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি বলতে যা আছে তাকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও বলা চলে। মানিকগঞ্জের একটি স্কুলে যন্ত্রপাতির বাক্স বৃষ্টিতে ভিজে পচে গেছে। ভাঙাচোরা দুটি আলমারীর ভেতরের বস্তু সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীরা অজ্ঞ ও কৌতূহলহীন।

ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করলে তারা জানায়, প্র্যাকটিক্যালের কথা মাঝে-মধ্যে তারা শোনে বটে কিন্তু এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ খুবই কম।

শহরাঞ্চলের বিশেষত সরকারী স্কুলগুলোর অবস্থা তুলনামূলকভাবে কিছুটা উন্নত। তবে সরকারী স্কুলের সংখ্যা অনেক কম, মাত্র ৩১৬টি। বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা আট হাজার ৪১৩ (এই হিসাবে জুনিয়র হাইস্কুল অন্তর্ভুক্ত নয়)। বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পে, অল্প কিছু স্কুলে বিজ্ঞান উপকরণ যন্ত্রপাতি দেয়া হলেও সেগুলোর ব্যবহার নেই। সংরক্ষণের কোন প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করিনি।

কলেজ পর্যায়েও প্র্যাকটিক্যালের অবস্থা সুবিধার নয়। সারাবছর পাঠক্রমের সঙ্গে সংশ্রবহীন থেকে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী প্র্যাকটিক্যাল ও মৌখিক পরীক্ষায় 'সম্মান-

(৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পাতার পর) দেশের ৭০ শতাংশ স্কুলেই ল্যাবরেটরী নেই

জনকভাবে' উৎরে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ২৫ নম্বরের মধ্যে ২৫-ই পেয়ে যাচ্ছে তারা। এ ঘটনায় সত্যিকার অনুসন্ধিৎসু অনেক মেধাবী চাত্র বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

একজন প্রবীণ অধ্যক্ষ জানান, দেশে বর্তমানে যে মানের বিজ্ঞান শিক্ষাদান পদ্ধতি চলছে তাতে প্রকৃত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের অবমূল্যায়ন হচ্ছে। একজন ছাত্র পড়াশোনা, পরিশ্রম না করেই ভাল নম্বর পেয়ে যায়। পাশাপাশি মেধাবী ছাত্র তার চেয়ে কম নম্বর পায়। এই পরিস্থিতিতে 'শর্টকাট' কিংবা দু'নম্বরী ব্যবস্থা নিলে সে ছাত্রকে দোষ দেয়া চলে না।

বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী কমে যাচ্ছে

স্কুল পর্যায়ে প্রতি বছর বিজ্ঞান শিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে না। সামগ্রিক হিসাব অবশ্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের হাতে নেই। স্কুল-কলেজ ঘুরে দেখা গেছে, বিজ্ঞানের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এসএসসি, এইচএসসি'র ফল পর্যালোচনা করলেও এ সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে। দেখা যায়, ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের পাসের হার বেশী। তবুও মেয়েরা বিজ্ঞানমুখী হচ্ছে না। বরং তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে দিন দিন।

গত '৯০ সালে ঢাকা বোর্ডে এসএসসিতে বিজ্ঞানে উত্তীর্ণ ছেলেদের হার ছিল ৭২ শতাংশ। মেয়েদের হার ছিল ২৮ শতাংশ। একই বছর এইচএসসি বিজ্ঞান শাখায় উত্তীর্ণ মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮০ শতাংশ ছিল পুরুষ। বিপরীতে মহিলাদের হার ছিল মাত্র ২০ শতাংশ।

ব্যাপক বিজ্ঞান শিক্ষা ও জাতীয় জীবনে তার কার্যকর প্রয়োগ ছাড়া আর্থ-সামাজিক চেহারা পাল্টানো সম্ভব নয়। সে লড়াইয়ে মেয়েরা পিছিয়ে থাকছে। অথচ জনসংখ্যার অর্ধাংশ মহিলাদের এই কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে না পারলে সকল প্রচেষ্টা বিফল হতে বাধ্য।

মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুনীল রঞ্জন রায় জানালেন, মেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার যা কিছুটা আগ্রহ দেখা যায়, সেটা প্রধানত মাধ্যমিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ। দ্রুত সে আগ্রহ কমতে থাকে। তাছাড় ও অন্যান্য অনেক কারণ এক্ষেত্রে নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। গ্রামাঞ্চলের যেসব মেয়ে বিজ্ঞান পড়ে তারা সাধারণত অপেক্ষাকৃত সচ্ছল, শিক্ষিত, সচেতন পরিবার থেকে আসে। এসএসসি পাস করার আগেই অনেকের বিয়ে হয়ে যায়, চুকিয়ে দেয়া হয় পড়াশোনার পাট। গ্রামাঞ্চলে বেশীরভাগ অভিভাবকই চান মেয়ে ভালভাবে পাস করলে সুপাত্র জুটবে। জুটে গেলে পরীক্ষা চলাকালীনই অনেক মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। এসএসসি পাস করলেও শহরে মেয়েকে রেখে পড়াশোনা করানো, খরচ যোগানো অনেক অভিভাবকের পক্ষেই সম্ভব হয় না।

সরকারী একটি কলেজের অধ্যক্ষ জানান, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী পর্যায়ের বিজ্ঞান শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। কি কারণে এটা ঘটছে? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বিজ্ঞানে পাস করার পর ভবিষ্যত অনিশ্চিত অনুজ্জ্বল। কর্মসংস্থানের কোন নিশ্চয়তা নেই। বিজ্ঞান পড়াশোনায় পরিশ্রম ও খরচ বেশী। সে কারণে ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ আকর্ষণ কমতির দিকে। এ অবস্থা চলতে থাকলে জাতির ভবিষ্যত কি রকম হবে তা কল্পনা করা কঠিন।

সব মেধা ও প্রতিভা কি শহরেই?

গত কয়েক বছরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সম্মিলিত মেধা তালিকার প্রায় সকলেই শহরের স্কুল-কলেজের। সম্মিলিত মেধা তালিকার ২০টি স্থান সবগুলোই পায় বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা। এতে দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞান বিষয়ক মেধা ও প্রতিভা শহরেই কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। অথচ মোট জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশের বাস গ্রামাঞ্চল বিজ্ঞানের আলো ও উৎকর্ষের স্বাদ থেকে বহুদূরে।

শহরেও হাতে গোনা কয়েকটি স্কুল-কলেজই ঘুরে ফিরে আসে মেধা তালিকায়। স্কুল-কলেজের অবস্থান শহরে হলেই যে তার মান উন্নত হবে তেমন দাবী করা যায় না। শহরে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে যেগুলোতে বিজ্ঞান শাখা চালু রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। '৯০ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফল-ঢাকার একটি নামী কলেজে বিজ্ঞানে পাসের হার ৯২ দশমিক ৩৬ শতাংশ। পাশাপাশি খোদ রাজধানীতেই অন্য একটি কলেজে ২৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে দুজন মাত্র পাস করেছে। দুজনেরই দ্বিতীয় বিভাগ। প্রথম ও তৃতীয় বিভাগ কেউ পায়নি। ময়মনসিংহ শহরের একটি কলেজে বিজ্ঞানে পাসের হার মাত্র দুই শতাংশ।

কুমিল্লা বোর্ডের '৯১ সালের এসএসসি পরীক্ষা। চান্দিনা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী ছিল এক হাজার ৪০৯ জন। তার মধ্যে বহিষ্কৃত হয়েছে ১৪৫ জন। অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল চার। স্থগিত রাখা হয়েছিল ৬০ জনের রেজাল্ট। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় নকল প্রবণতা কি রকম ভয়াল থাবা বিস্তার করেছে। বিজ্ঞানে নকল করার সুবিধা বেশী। প্রকৃত বিজ্ঞানপ্রেমের চেয়ে নকল করে ভাল ফলের প্রত্যাশায় বিজ্ঞান পড়ে, তাদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।